ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2116-2126
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.473

বাংলা লোকসংস্কৃতির আলোকে রাঢ় অঞ্চলের লোকাচার ও পূজা

সৌভিক সাহা, *ছাত্র, বাংলা বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.04.2026; Accepted: 29.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The folk culture of Bengal, especially in the Rarh region, shows a deep connection between people, nature, and religious belief. It is a way of life where daily activities, faith, and environment are closely linked. Rituals like Jitashtami, the worship of Keshabasini, and Malancha Devi show how people mix spiritual belief with their real-life needs. These traditions are not only about prayer. They help people deal with fear, sickness, uncertainty, and problems of life. In these practices, both good and harmful forces are respected. People worship gods and also symbolic animals like foxes and vultures. This shows how humans try to understand fear, death, and danger in their own cultural way. Women play a very important role in these rituals, and they help keep these traditions alive in families and communities. Nature is also very important in Bengal's folk culture. Trees, crops, and plants are seen as symbols of life, growth, and stability. These beliefs also help protect nature. These rituals bring people together and reduce social differences like caste. Overall, the folk culture of Bengal shows a strong vision of unity between humans, society, and nature, where everything is connected and meaningful.

Keywords: Bengali Folk Culture, Rarh Region Traditions, Nature Worship, Social Unity, Nature and Rituals

বাংলার রাঢ় অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি এমন এক সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক ঐতিহ্যের ধারক, যেখানে ধর্মীয় আচার, প্রকৃতি, সামাজিক সম্পর্ক একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই সংস্কৃতিতে দেব-দেবীর পূজা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়; বরং তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, ভয়, আশা, রোগ, শোক, জীবিকা এবং পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত। জিতাষ্টমী পূজা, কেশবাসিনী দেবীর আরাধনা ও মালঞ্চ দেবীর পূজা এসব লোকাচারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একদিকে অশুভ শক্তিকে প্রশমিত করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে শুভ শক্তির আহ্বান। একই সঙ্গে এই আচারগুলি নারী কেন্দ্রিক অংশগ্রহণ, সমষ্টিগত সামাজিক সংহতি এবং প্রকৃতি নির্ভর জীবনদর্শনের এক অনন্য রূপ তুলে ধরে। ফলে রাঢ় অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি সমগ্র জীবনব্যবস্থা, যেখানে মানুষ, সমাজ এবং প্রকৃতি এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ।

জীতাষ্টমী পূজা:

জীতাষ্টমী পূজা হল শুভ ও অশুভ প্রতীকের পূজা । পূজাতে দেখা যায় শুভ শক্তির পূজার পর অশুভ শক্তির পূজা, যা এক বৈচিত্র সৃষ্টি করে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে। বাংলার ঘরে বৈদিক পূজা পদ্ধতিতে প্রধান দেব বা দেবীর পূজার আগে অশুভ শক্তির পূজার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করা হয় এবং তারা যেন পুজোতে কোন রকম বাঁধা সৃষ্টি না করে তার জন্য মাসকলাইযুক্ত নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। ভুতাদিগণের পূজান্তে মূল দেব বা দেবীর পূজা শুরু হয়।

> "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ, রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
> অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে, দুর্গাপূজাং করোম্যহম্॥
> ওঁ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রাঃ, যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ।
> সিদ্ধার্থ কৈবজ্রসমানকল্পে, ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্ত।
> ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা, যে ভূতা ভূমিপালকাঃ।ভূতানামবিরোধেন, পূজাকর্ম্ম করোম্যহম্।"[১]

জীতাষ্টমী পূজার প্রচলন শুধুমাত্র বাঁকুড়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি প্রচলিত বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া জেলাতে। এই পূজার তিথিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেখা যায় ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী এবং অষ্টমী তিথির সন্ধিক্ষণে পূজাটি পালিত হয়। এই সন্ধিক্ষণ বাঙালির হৃদয়কে মনে করিয়ে দেয় দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণকে, যেখানে অশুভক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়।

> "চান্দ্র ভাদ্র অথবা সৌর ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমীর শেষ মুহূর্তে এবং অষ্টমীর শুরুতে জিতাষ্টমী পূজা হয়। বাঁকুড়া ছাড়াও এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ার বহু গ্রামে।"[২]

জীতাষ্টমী পূজা মূলত দেবরাজ ইন্দ্র, মেঘ, ষষ্ঠী দেবী এবং অশুভ শক্তিরূপে শিয়াল এবং শকুনের পূজা করা হয়। (শুভ শক্তি বলতে এই পূজার ক্ষেত্রে ইন্দ্র দেব, ইন্দ্র দেবের বাহন মেঘ এবং দেবীর ষষ্ঠীর পূজার কথা বলা হয়েছে।)

> "পূজাটি যুগপৎ বৈদিক দেবতা জীমূতবাহন ও লৌকিক দেবী ষষ্ঠীকে লক্ষ্য করে করা হয়। জীমূত বাহনের বাহন হল মেঘ।"[৩]

শেয়াল ও শকুনের পূজা প্রসঙ্গ-

> "সঙ্গে নিয়ে যান শেয়াল শকুনি। অবশ্যই যাদের পূজা হয়েছে।"[৪]

পূজার এই ধারণাটি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক একটি প্রাথমিক স্তরকে প্রতিফলিত করে। মানুষ সাধারণত ভয়কে এড়িয়ে যেতে চায়, কিন্তু শেয়াল এবং শকুন যারা মৃতদেহভোজী এবং মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তাদের পূজার মাধ্যমে মানুষ যেন মৃত্যু ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে।

এখানে পূজা একটি প্রতিরোধমূলক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, যেখানে অশুভ শক্তিকে পূজা ও উপাচারের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা হয় এবং তাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই পদ্ধতিতেই অশুভ শক্তিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, যা লৌকিক প্রথার এক চিরাচরিত ধারা। জীতাষ্টমী পূজা লৌকিক পূজা হলেও এই পূজার একটি রাজকীয় মান্যতা রয়েছে, কারণ এই পূজার পরই শুরু হয় বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ পরিবারের শাক্ত দেবী মৃন্ময়ীর পূজা।

> "জিতাষ্টমীর পরের নবমীতে প্রথমে আসেন 'বড়ঠাকরুণ'।"[৫]

"জিতাষ্টমী বা তার পরের দিন কল্লারম্ভে মল্লরাজাদের মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরে আসেন বড় ঠাকরুণ নামক দেবী। মান চতুর্থীর দিনে আসেন সেজ ঠাকরুণ আর ছোট, যিনি ষষ্ঠীর দিনে আসেন তিনি ছোট ঠাকরুণ নামে পরিচিতা।"[৬]

এই পূজার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, এই পূজাটি মূলত নারী কেন্দ্রিক।

> "এই পূজায় অংশ গ্রহণ করেন গিন্নী বধূ এবং কুমারী মেয়েরা। শিশু এবং কিশোরদেরও পূজাস্থানে ভিড় করতে দেখা যায়।"[৭]

তৎকালীন সমাজে যখন রোগ, মহামারী এবং অকালমৃত্যু ছিল জীবনের অনিবার্য অংশ, তখন এই ধরনের আচার মানুষের মানসিক নিরাপত্তা প্রদান করত। আধুনিক সমাজে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হলেও, এই পূজার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে মানুষের অন্তর্নিহিত ভয় এবং বিশ্বাসের বহু প্রাচীন। গ্রামীণ সমাজে নারীর প্রধান দায়িত্ব ছিল পরিবার রক্ষা, সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালন। ফলে সন্তানের মঙ্গল কামনা, পরিবারের সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ুর কামনা নারীর জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। এই পূজার মাধ্যমে নারীরা একদিকে তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন, অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করেন। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে পুরুষের উপস্থিতি গৌণ এবং নারীরাই প্রধান নিয়ন্ত্রক। এই দিকটি আমাদের দেখায় যে, লোকসংস্কৃতির মধ্যে নারীর একটি স্বতন্ত্র ক্ষমতার পরিসর তৈরি হয়েছিল, যা সমাজের অন্য স্তরে সবসময় দৃশ্যমান ছিল না। বর্তমান সমাজে নারীর ভূমিকা অনেকটাই পরিবর্তিত হলেও, এই পূজার মধ্যে সেই ঐতিহ্যগত নারী-নেতৃত্ব এখনও বজায় রয়েছে, যা একধরনের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার প্রমাণ যা সহজে পরিবর্তিত হয় না।

এই পূজাতে ব্যবহৃত বটগাছ শুধু একটি উদ্ভিদ নয়, বরং একটি গভীর সাংস্কৃতিক প্রতীক। গ্রামীণ সমাজে যেখানে মানুষের জীবন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, সেখানে বটগাছের দীর্ঘজীবন ও স্থায়িত্ব মানুষের কাছে এক আদর্শ হিসেবে প্রকাশিত হয়। বটগাছ বহু বছর ধরে বেঁচে থাকে, তার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং তার ছায়া বহু জীবকে আশ্রয় দেয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাকে দীর্ঘায়ু, স্থিতি এবং সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। পূজার সময় এই বটডালকে বাড়ির উঠানে পুঁতে দেওয়া মানে হল সেই স্থিতিশীলতা ও আশ্রয়কে নিজের জীবনে আমন্ত্রণ জানানো।

> "গ্রামের কাছাকাছি কোন বটবৃক্ষ থেকে একটি নাতিবৃহৎ বটডাল কেটে এনে বাড়ীর উঠানে পুঁতে দেওয়া হয়।বটবৃক্ষ হল শান্তি ও দীর্ঘায়ুর প্রতীক।"[৮]

পূজাতে যে উপাদানগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন মানকচু, জয়ন্তী, হলুদ ও ধানের চারা এগুলিকে যদি গভীরভাবে দেখা যায়, তাহলে বোঝা যায় এগুলি কেবল পূজার সামগ্রী নয়, বরং এগুলি গ্রামীণ জীবনের প্রতীকী ভাষা।

> "বটডালটির গোড়ায় রাখা হয় মানকচু, জয়ন্তী, হরিদ্র ও ধানের চারা।লোক বিশ্বাস এগুলি দেবী দুর্গার আগমনের পূর্বাভাস।"[৯]

এই ধারণাটি আসলে প্রকৃতিকে দেবত্বের সঙ্গে একাত্ম করার এক সহজ অথচ গভীর উপায়। এখানে দেবীর আগমন আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়, বরং মাটির মধ্যে, গাছের মধ্যে, ফসলের অঙ্কুরোদ্গমের মধ্যেই দেবীকে উপলব্ধি করা হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির পুনর্জাগরণই দেবীর আগমনের চিহ্ন। অন্যদিকে এই উপাদানগুলো নবপত্রিকার কয়েকটি রূপ। নবপত্রিকার প্রতিটি গাছ গুলোই দেবী দূর্গার একেকটি রূপ হিসাবে বিবেচিত হয়। ধানের চারা এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি শুধু একটি গাছ নয়, বরং

গ্রামীণ মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তি। ধান মানেই খাদ্য, আর খাদ্য মানেই জীবন। তাই পূজার অংশ হিসেবে ধানের চারা রাখা মানে জীবনের মূল উৎসকে দেবীর সঙ্গে যুক্ত করা। এতে একদিকে খাদ্যের নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, এবং দেবীর প্রতি নির্ভরতার বোধও দৃঢ় হয়। অন্যদিকে ধানগাছ স্বয়ং দেবী লক্ষ্মীর স্বরূপ।

"ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব।"[১০]

হলুদ এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। গ্রামীণ জীবনে হলুদ ব্যবহৃত হয় শুদ্ধতা, স্বাস্থ্য এবং শুভ শক্তির জন্য। এটি যেমন ধর্মীয় আচারকে পবিত্র করে, তেমনি দৈনন্দিন জীবনে রোগ প্রতিরোধের একটি উপাদান হিসেবেও কাজ করে। ফলে এর ব্যবহার একাধারে বাস্তব এবং প্রতীকী, শরীর ও আত্মা উভয়ের সুরক্ষার ইঙ্গিত বহন করে। অন্যদিকে এটি দেবী দূর্গার অন্য আরেকটি রূপ হিসেবে বিবেচিত।

"ওঁ হরিদ্রে হররূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়ে। রুদ্ররূপাসি দেবি ত্বং সর্বশান্তিং প্রযচ্ছ মে।"[১১]

জয়ন্তী গাছের উপস্থিতি পূজায় একটি আশাবাদের সুর এনে দেয়। এটি শুভ শক্তি ও সাফল্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। গ্রামীণ জীবনে যেখানে অনিশ্চয়তা একটি স্থায়ী বাস্তবতা, সেখানে এই ধরনের প্রতীক মানুষের মনে একধরনের ইতিবাচক শক্তি জাগিয়ে তোলে। জয়ন্তীগাছ যেন সেই প্রত্যাশার প্রতিনিধিত্ব করে, যা মানুষ ভবিষ্যতের জন্য লালন করে।

অন্যদিকে এটিও দেবীর নব রূপে অপরূপা একটি রূপ।

"ওঁ জয়ন্তি জয়রূপাসি জগতাং জয়কারিণি। স্নাপয়ামীহ দেবি ত্বাং জয়ং দেহি গৃহে মম।"[১২]

মানকচুও এই ধারার বাইরে নয়। এটি মাটির গভীরে জন্মায় এবং প্রতিকূল পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। তাই এটি সহনশীলতা ও স্থায়িত্বের প্রতীক। গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রাও অনেকাংশে এই সহনশীলতার উপর নির্ভরশীল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য কিংবা অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা টিকে থাকার পথ খুঁজে নেয়। এই সমস্ত উপাদান একত্রে একটি সম্পূর্ণ জীবনচক্রের প্রতিফলন তৈরি করে। এখানে প্রকৃতি, জীবিকা এবং বিশ্বাস একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের উপকরণগুলিকেই দেবতার সঙ্গে যুক্ত করে, ফলে ধর্ম কোনো আলাদা জগৎ হয়ে থাকে না এটি জীবনের মধ্যেই প্রবাহিত হয়।

জিতাষ্টমী পূজা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্র, দেবীচিন্তা, নৈবেদ্য ও সামষ্টিক আচারের সমগ্র রূপটি যদি তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে বিচার করা হয়, তাহলে এটি এক জটিল কিন্তু সুসংবদ্ধ গ্রামীণ জীবনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি হিসেবে ধরা পড়ে। এখানে ধর্ম কেবল বিশ্বাসের বিষয় নয়, বরং জীবনরক্ষার কৌশল, সামাজিক সংগঠন এবং মানসিক স্থিতির একটি অবলম্বন।

"ত্বং দূর্বের্বহমুত নামামি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ।"[১৩]

এই উচ্চারণের মধ্যে তৎকালীন মানুষের এক মৌলিক অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষ বুঝেছিল, কিছু শক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। খরা, অতিবৃষ্টি, রোগ, মৃত্যুর মতো অনিশ্চয়তা তাদের জীবনকে ক্রমাগত বিপন্ন করে তুলত। এই পরিস্থিতিতে দূর্বার মতো এক সহনশীল, অবিনাশী উদ্ভিদ তাদের কাছে এক প্রতীক হয়ে ওঠে, যা ধ্বংসের মধ্যেও টিকে থাকে। তাই তাকে এমন এক সর্বজনীন শক্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এর সামাজিক তাৎপর্য হল, মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে সহাবস্থান শেখার চেষ্টা করেছে।

"সৌভাগ্য সন্ততিং দত্ত্বা সর্ব্ব কার্যকরী ভব।"[১৪]

কৃষিনির্ভর সমাজে শ্রমই ছিল প্রধান সম্পদ, আর সেই শ্রমের উৎস ছিল পরিবার ও সন্তান। অধিক সন্তান মানে অধিক কর্মশক্তি, অধিক উৎপাদন এবং পরিবারে স্থিতি। ফলে সন্তানের কামনা এখানে শুধুমাত্র আবেগের বিষয় নয়, বরং একটি বাস্তব প্রয়োজন। একইভাবে এই প্রার্থনা দেখায় যে, মানুষের প্রতিটি কাজ, চাষাবাদ,

গৃহস্থালি, সামাজিক দায়িত্ব সবই অনিশ্চয়তার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাই সাফল্যের জন্য একটি অতিপ্রাকৃত আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। এই মন্ত্র সেই প্রয়োজনেরই প্রতিফলন।

"যথা প্রশাখাভিবিস্তৃতাসি মহীতলে তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরণম্।"[১৫]

দূর্বার মতো ছড়িয়ে পড়া মানে শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, বরং টিকে থাকা, বিস্তারলাভ করা এবং সামাজিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা। একটি গ্রামে যে পরিবার যত বিস্তৃত, তার সামাজিক প্রভাব তত বেশি এই ধারণাও এর মধ্যে নিহিত। এখানে বাস্তব অমরত্ব নয়, বরং দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের কামনা, যা তখনকার অনিশ্চিত জীবনে এক বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল।

নৈবেদ্যের উপকরণ হিসাবে আতপ চাল, চিঁড়ে, গুড়, দুধ, ফল এসবের মধ্যেও তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়। এগুলি এমন উপাদান, যা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। এতে বোঝা যায়, এই পূজা ছিল জনসাধারণের, কোনো অভিজাত বা বিলাসবহুল আচার নয়। এখানে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হচ্ছে সেই খাদ্য, যা মানুষ নিজে উৎপাদন করে। অর্থাৎ নিজের জীবনের সারাংশই দেবীর কাছে নিবেদন করা হচ্ছে। এটি একধরনের সামাজিক সমবণ্টনের ধারণাকেও ইঙ্গিত করে, যেখানে দেবতা ও মানুষ একই খাদ্যের অংশীদার। জিতাষ্টমী ব্রত বা পূজা তৎকালীন সমাজে একটি বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করত। এটি ছিল একদিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রকাশ, অন্যদিকে সামাজিক সংহতি রক্ষার মাধ্যম, আবার একই সঙ্গে অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও পারিবারিক কাঠামোর প্রতিফলন। এই ব্রতের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার ভয়, আশা, বিশ্বাস এবং জীবনের প্রয়োজনকে একত্রে প্রকাশ করেছে, যা তাকে সেই অনিশ্চিত সময়ের মধ্যে টিকে থাকার শক্তি জুগিয়েছে।

> "পরের দিন সূর্যোদয়ের পর ঐ বটেরডাল ও পূজার স্থানের অন্যান্য দ্রব্যাদি পুকুরে বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামের উপবাসী ব্রতী মেয়েরা ঐ সময়ে পুকুরে বা নদীর ঘাটে যান। সঙ্গে নিয়ে যান শেষাল শকুনি। অবশ্যই যাদের পূজা হয়েছে, তাদেরই নিয়ে যাওয়া হয়। আরও নেওয়া হয় চিড়ে, মুড়ি, দই, দুধ, গুড়, শশা ইত্যাদি। ঐ বটডাল বিসর্জন হওয়ার পর ব্রতীরা শেয়াল শকুনি বিসর্জন দিয়ে ডুব দেন। ডুব দিয়ে উঠে প্রথমে শশায় কামড় দেন। তারপর মেঘদর্শন করেন। তারপর করেন সূর্যদর্শন। সূর্যকে দর্শন করে প্রণাম করা হয়।"[১৬]

জিতাষ্টমী পূজার সমাপনী আচার যা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ককে প্রকাশ করে। বটডাল ও অন্যান্য উপকরণ জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া মানে একধরনের পুনর্নিবেদন, প্রকৃতি থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তা আবার প্রকৃতিকেই ফিরিয়ে দেওয়া। এটি একটি চক্রাকার ধারণা, যেখানে সৃষ্টি ও বিলয় একে অপরের পরিপূরক। ব্রতীদের জলস্নান বা ডুব দেওয়া একটি শুদ্ধিকরণের প্রতীক। উপবাস ও পূজার মাধ্যমে তারা যে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছে, তার পরিশেষে এই স্নান তাদের শরীর ও মনকে পরিশুদ্ধ করে। এরপর শশা খাওয়ার প্রথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ উপবাসের পর শশা, যা শীতল ও জলীয় প্রকৃতির, তা খাওয়া শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করে। এটি শুধু শারীরিক নয়, প্রতীকী অর্থেও নতুন জীবনের সূচনা।

মেঘদর্শন ও সূর্যদর্শন এই আচারকে আরও গভীর মাত্রা দেয়। মেঘ জীমূতবাহনের বাহন হিসেবে জীবনদায়ী বৃষ্টির প্রতীক, আর সূর্য আলো ও শক্তির উৎস। এই দুইয়ের প্রতি প্রণাম জানানো মানে প্রকৃতির দুই মৌলিক শক্তিকে স্বীকার করা। এই পুরো প্রক্রিয়াটি দেখায় যে, মানুষের ধর্মচর্চা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এখানে দেবতা ও প্রকৃতি আলাদা নয়, প্রকৃতিই দেবতার রূপ ধারণ করেছে।

"শেয়াল গেল খালকে/ শকুনি গেল ডালকে।

বিশ্বাস, আগের রাতে উপবাস দিয়ে শকুন ঠিকমত ব্রত উদ্যাপন করেছিল, কষ্ট স্বীকার করেছিল, কিন্তু শেয়াল মাঠ থেকে কাঁকড়ি খেয়েছিল। তাই ছড়ায় তাকে পাঠান হয় খালে।"[১৭]

এই লোকছড়াটি জিতাষ্টমী পূজার একটি সামাজিক ও নৈতিক দিককে প্রকাশ করে। প্রথম দৃষ্টিতে এটি একটি সাধারণ ছড়া মনে হলেও, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর শিক্ষা। এখানে শকুনকে উপবাস ও নিয়ম পালনকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে, আর শেয়ালকে লোভী ও অনিয়মকারী হিসেবে। ফলে শেয়ালকে শাস্তি হিসেবে খালে পাঠানো হয়েছে।

এই ছড়ার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিশু-কিশোররা এই ছড়া শুনে শিখে নেয় আত্মসংযম এবং ত্যাগ এই গুণগুলি। অন্যদিকে লোভ ও অসংযমের পরিণতি নেতিবাচক। এই ছড়াটি মৌখিক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। এর মাধ্যমে সমাজ তার অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধকে সহজ ভাষায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়।

এখানে শেয়াল ও শকুনি কেবল প্রাণী নয়, বরং এরা মানবচরিত্রের প্রতীক। এই প্রতীকী উপস্থাপনা লোকসংস্কৃতির একটি শক্তিশালী দিক, যা জটিল নৈতিক ধারণাকে সহজভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। সাধারণ ব্রতের মত এই ব্রতের পদ্ধতি এবং উপকরণ একই অন্যদিকে ব্রতের শেষে অন্যান্য ব্রতের মতো এই ব্রততেও ব্রতের মাহাত্ম্য প্রচারের একটি ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সাধারণত ব্রতের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের ভূমিকা থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রধান পূজক হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। তাই এটিকে পূজা অথবা ব্রত বলা হয় তা নিয়ে একটি সংশয় তৈরি হয়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, জিতাষ্টমী বা শেয়াল-শকুনি পূজা গ্রামীণ বাংলার এমন এক লোকাচার, যেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ভয়-আশা, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক এবং সামাজিক বন্ধন একসঙ্গে প্রকাশ পায়। এখানে অশুভকে প্রশমিত করার চেষ্টা, প্রকৃতির শক্তিকে সম্মান জানানো এবং পরিবার-সমাজের মঙ্গলকামনা সবকিছুই একসূত্রে গাঁথা। বিশেষ করে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই আচারকে আরও জীবন্ত ও ধারাবাহিক করে তুলেছে।

এই লোকাচার সম্পর্কে বর্ধমানের একজন তরুণী জানান -

"আমি ছোটবেলা থেকে মায়ের সঙ্গে এই পূজা করে আসছি। আগে সবকিছু বুঝতাম না, কিন্তু এখন মনে হয় এর মধ্যে একটা গভীর অর্থ আছে। উপবাস থাকা, নির্দিষ্ট নিয়ম মানা,এসব আমাদের ধৈর্য আর নিয়ন্ত্রণ শেখায়। আমাদের প্রজন্ম অনেক কিছু বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়, কিন্তু এই ধরনের লোকাচারের মধ্যে একটা মানসিক শান্তি আছে, যা অন্যভাবে পাওয়া কঠিন। পূজার দিন আমরা সবাই একসঙ্গে থাকি, গল্প করি, হাসি, এটা একটা সামাজিক বন্ধন তৈরি করে।"[১৮]

অন্যজন এই পূজার সূচনা সম্পর্কে জানান,

"আমরা ঠিক সাল তারিখ বলতে পারব না, আমার বাপের বাড়িতে এই পুজোর চল ছিল না, কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে এই ব্রত আমার ঠাকুমা শাশুড়ি করতেন, পরবর্তীতে আমার শাশুড়ি করছেন।"[১৯]

অন্যজন পূজার পদ্ধতি সম্পর্কে জানান,

"আগে চার প্রহরের পুজো হতো কিন্তু এখন এক প্রহরে চার প্রহরের পূজো করা হয়, এবং এই পূজোতে শাপলা ফুলের মালা দিতে হয়।"[২০]

কেশবাসিনীর পূজা:

বাঁকুড়া জেলার গ্রামীণ সমাজে লৌকিক দেব-দেবীর পূজা এক গভীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ, যার মধ্যে মানুষের বিশ্বাস, জীবনযাত্রা এবং প্রকৃতিনির্ভর চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে কেশবাসিনী দেবীর পূজা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চা। কোচকুড়া গ্রামের এই দেবীকে ঘিরে যে পূজা-পদ্ধতি, লোকবিশ্বাস ও আচার গড়ে উঠেছে, তা গ্রামীণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, ভয়-আশা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের এক জীবন্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

> "গ্রামটির বাসিন্দাদের মধ্যে আছেন ব্রাহ্মণ, তিলি, কর্মকার, নন্দী, বাদী, গরাই, সূত্রধর, গোয়ালা, কুম্ভকার, বাউরী প্রভৃতি।"[২১]

গ্রামটির বহুজাতিক ও বহুবর্ণের সামাজিক গঠন এখানে উল্লেখযোগ্য, ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে বাউরী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সহাবস্থান একটি সামগ্রিক গ্রামীণ সমাজের প্রতিচ্ছবি। সাধারণত ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে জাতিভেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হলেও, এই পূজার ক্ষেত্রে সেই ভেদরেখা অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অংশগ্রহণের বিষয়টি নির্দেশ করে যে এই পূজা একধরনের সামষ্টিক চেতনার বাহক, যেখানে ধর্মীয় আচার সামাজিক ঐক্যের মাধ্যম হয়ে ওঠে। পূজার মাধ্যমে একটি সমবেত পরিচয় গড়ে ওঠে, যা ব্যক্তিগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে। প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী উপকরণ এনে দেয়, পূজায় অংশ নেয় এর ফলে সামাজিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরতার একটি কাঠামো তৈরি হয়। এটি গ্রামীণ সমাজের টিকে থাকার অন্যতম ভিত্তি। এখানে ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিক চর্চা নয়, বরং সামাজিক সংহতির একটি কার্যকর মাধ্যম। বিভিন্ন পেশা ও জাতির মানুষ একত্রে পূজায় অংশগ্রহণ করে, ফলে পারস্পরিক দূরত্ব কমে এবং একটি সম্মিলিত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই দিক থেকে কেশবাসিনী পূজা গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, যা সমাজকে একত্রে বেঁধে রাখে।

> "কুসুম গাছের তলদেশে গ্রামের শেষ পশ্চিম প্রান্তে দেবীর অবস্থান। কেশ-বাসিনী আসলে দুর্গার লৌকিক রূপ। দেবীর পূজায় যাগ যজ্ঞ হোম এমনকি চণ্ডীপাঠও হয়। পূজায় ঢাক বাজে। দেবীর বীজমন্ত্র ওঁ হ্রীং। গ্রামের ব্রাহ্মণ পুরোহিতে পূজা করেন। পূজায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নরনারীই যোগদান করে। দেবীর থানে বেশ কয়েকটি আস্ত ও ভগ্নাদশাপ্রাপ্ত মাটির তৈরী হাতী ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়।"[২২]

দেবীর অবস্থান গ্রামের প্রান্তে, একটি কুসুম গাছের তলায় এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামীণ লোকবিশ্বাসে গ্রামের সীমানা বা প্রান্ত অঞ্চলকে একটি সংবেদনশীল স্থান হিসেবে দেখা হয়, যেখানে বাইরের অশুভ শক্তির প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। ফলে এই ধরনের স্থানে দেবীর অবস্থান মানে তিনি একপ্রকার রক্ষাকর্ত্রী, যিনি গ্রামকে অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা করেন।

কুসুম গাছ নিজেও একটি প্রাকৃতিক প্রতীক। গাছের নিচে দেবীর অবস্থান প্রকৃতি পূজার একটি স্পষ্ট নিদর্শন। এখানে কোনো স্থায়ী মন্দির বা প্রতিমা নেই, বরং প্রকৃতিই দেবীর আসন। এটি দেখায় যে এই পূজার মূল ভিত্তি প্রকৃতি নির্ভর বিশ্বাস। হ্রীং বীজমন্ত্র এবং দুর্গার ধ্যান মন্ত্রে পূজা করার বিষয়টি তৎকালীন ধর্মীয় রূপান্তরের দিকটি স্পষ্ট করে। মূলত লোকায়ত প্রকৃতি পূজার সঙ্গে ধীরে ধীরে শাক্তধর্মের তান্ত্রিক উপাদান যুক্ত হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় দেবী একটি বৃহত্তর ধর্মীয় কাঠামোর অংশ হয়ে উঠেছে। এই প্রক্রিয়াটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে সমাজে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে স্থানীয় বিশ্বাস ও ধর্মচিন্তা একে অপরকে প্রভাবিত করে।

মাটির তৈরি হাতি-ঘোড়া এই পূজার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এগুলি সাধারণত মানত পূরণের প্রতীক হিসেবে নিবেদন করা হয়। ভগ্নপ্রায় অবস্থায় তাদের উপস্থিতি নির্দেশ করে দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ তাদের বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা এইভাবে প্রকাশ করে এসেছে। এই প্রতীকগুলি একত্রে একটি জীবন্ত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দেয়, যেখানে স্থান, প্রকৃতি ও মানুষের বিশ্বাস একসূত্রে গাঁথা।

> "পূর্বে দেবীর পূজার জন্য জমি বন্দোবস্ত ছিল। বর্তমানে গ্রামবাসীদের সমবেত প্রয়াসে পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।"[২৩]

অতীতে যখন জমির বন্দোবস্ত ছিল, তখন পূজার একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। জমি থেকে প্রাপ্ত আয় পূজার খরচ বহন করত, ফলে আয়োজন ছিল তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল।

কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই ব্যবস্থা আর নেই। এখন পূজা সম্পূর্ণভাবে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এই পরিবর্তন একদিকে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, অন্যদিকে সামাজিক অংশগ্রহণের গুরুত্বও বৃদ্ধি করে। এখন প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখে কেউ অর্থ দেয়, কেউ উপকরণ, কেউ শ্রম।

এই সমবেত প্রয়াস একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, যেখানে পূজা আর কোনো নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পুরো গ্রামের সম্পত্তি হয়ে ওঠে। এতে সামাজিক সংহতি আরও দৃঢ় হয়। এছাড়া এই পরিবর্তন দেখায় যে লোকসংস্কৃতি স্থির নয় এটি সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও পূজার মূল ভাবনা অটুট থাকে, কারণ এটি মানুষের বিশ্বাস ও পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

দেবীর পূজা ক্ষেত্রে শনি মঙ্গলবার একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে, এই দেবীর পূজাটিও ব্যতিক্রম নয়।এই পূজার বিশেষত্ব হল, এটি কোনো বৃহৎ শাস্ত্রনির্ভর বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচারের অন্তর্গত নয়; বরং এটি সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এখানে দেবীকে কেবল এক অতিপ্রাকৃত শক্তি হিসেবে দেখা হয় না, বরং তাঁকে গ্রামের রক্ষাকর্ত্রী, দুঃখ-কষ্টের সময়ে আশ্রয়দাত্রী এবং দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে অনুভব করা হয়। ফলে এই পূজা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও সামষ্টিক জীবনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে।

> "কিংবদন্তী হ'ল দেবীর থানে যে মৃত কিংবা প্রাচীন বৃক্ষাদি আছে তা কেউ কাটতে পারেনা। কেউ কেউ নাকি চেষ্টা করে মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"[২৪]

এই ধরনের বিশ্বাস গ্রামীণ সমাজে পরিবেশ সংরক্ষণের একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক উপায় হিসেবে কাজ করে। দেবীর ভয়ে মানুষ গাছ কাটতে সাহস পায় না, ফলে প্রকৃতি সংরক্ষিত থাকে। এটি দেখায় যে লোকধর্ম কেবল আধ্যাত্মিক নয়, বরং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এই পূজাটি সাধারণ মানুষের রক্ষাকবজ পূজা হলেও এটি পরিবেশ রক্ষার একটি বার্তা দেয়।

মালঞ্চ দেবী:

> "গ্রামের উত্তর প্রান্তে রাস্তার ধারে একটি বড় বাঁধের পাড়ে অনুষ্ঠিত হয় মালঞ্চ দেবীর পুজা।"[২৫]

গ্রামপ্রান্তে দেবীর অবস্থান লোকধর্মে একটি সুপরিচিত ধারণা, যেখানে দেবতা বা দেবীকে এমন একটি স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয় যা গ্রাম ও বাইরের জগতের সীমানা হিসেবে কাজ করে। এই সীমান্তবর্তী অবস্থান দেবীকে এক ধরনের রক্ষাকর্ত্রী শক্তিতে পরিণত করে, যিনি বহিরাগত অশুভ শক্তি থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেন।

এখানে বাঁধের পাড়ে দেবীর অবস্থান আরও একটি তাৎপর্য বহন করে, কারণ বাঁধ জলধারণ ও সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত, যা কৃষিজীবী সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে দেবী এখানে কেবল আধ্যাত্মিক রক্ষাকর্ত্রী নন, বরং জীবিকার সুরক্ষার সঙ্গেও যুক্ত। এই অবস্থান এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে পরিচিত ও অচেনা, নিরাপদ ও অনিরাপদের সংযোগ ঘটে। দেবীর উপস্থিতি এই অনিশ্চয়তার মধ্যে স্থিতি ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। একই সঙ্গে এটি গ্রামীণ মানুষের প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাত্রার প্রতিফলন, যেখানে জল, মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

> "দেবীর বর্তমানে কোন মূর্তি নেই। অবশ্য বলা হয় যে বহু পূর্বে নাকি তাঁর প্রস্তরনির্মিত মূর্তি ছিল। বর্তমানে একটি মহুয়া গাছের তলায় অবস্থিত একটি বেদীর ওপরে রাখা কিছু নতুন ও পুরাতন মৃন্ময় হাতী ঘোড়াদের পূজা।"[২৬]

মূর্তির অনুপস্থিতি এখানে দেবত্বের বিমূর্ত ধারণাকে নির্দেশ করে, যা নির্দিষ্ট আকারে আবদ্ধ নয়। মহুয়া গাছের তলায় দেবীর অবস্থান প্রকৃতিনির্ভর ধর্মবিশ্বাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেখানে গাছকে জীবন্ত ও শক্তিসম্পন্ন সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়। দেবীর পূজা এখানে হয় চণ্ডিকা রূপে।

> "পুরোহিতের ধারণানুযায়ী দেবী চণ্ডিকার কোন রূপ মালঞ্চ দেবী নামে পূজিতা হচ্ছেন।"[২৭]

মাটির হাতি ও ঘোড়া এখানে দেবীর প্রতি ভক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি দেবীর বাহন বা শক্তির প্রতীক হতে পারে, আবার একই সঙ্গে স্থানীয় কারুশিল্প ও অর্থনীতির প্রতিফলন। লোকসংস্কৃতিতে এই ধারা চিরাচরিত। এই উপাচারগুলি সহজলভ্য এবং গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, ফলে ধর্মচর্চা এখানে সবার জন্য উন্মুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

এই প্রতীকী উপাসনা দেখায় যে লোকধর্মে আড়ম্বর বা শাস্ত্রীয় নিয়মের চেয়ে অনুভূতি ও বিশ্বাস বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দেবী এখানে মানুষের মনে, প্রকৃতির মধ্যে এবং প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থিত।

> "বহুকাল আগে থেকেই দেবীর পূজায় মেষ বলি চলে আসছে। বর্তমানে মেষ বলির সঙ্গে ছাগ বলিও হতে দেখা যায়। দেবীর পুজায় প্রসাদ হিসাবে প্রদত্ত হয় দুধ, চিঁড়ে, গুড় ইত্যাদি।"[২৮]

প্রাণী বলি প্রাচীন সমাজে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার একটি প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। মালঞ্চ দেবীর ক্ষেত্রে এই বলিপ্রথা তাঁর শক্তিরূপী দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠাকে নির্দেশ করে।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথার পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। মেষ বলির সঙ্গে ছাগ বলির সংযোজন একটি রূপান্তরের ইঙ্গিত দেয়, যা সমাজের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতিফলন। আধুনিক সময়ে এই ধরনের বলিপ্রথা নিয়ে নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন উঠলেও গ্রামীণ সমাজে এটি এখনও ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে টিকে রয়েছে। এই প্রথা ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি সামাজিক ঐক্য ও উৎসবের আবহও তৈরি করে। যেসব পরিবারের পুষ্টির উৎস হিসাবে মাংস কিনে খাওয়ার সামর্থ্য থাকে না তাদের জন্য বলির প্রসাদ সুষম পুষ্টির উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

> "পূজাটির আয়োজক গোয়ালা শ্রেণীর লোকেরা। এদের পদবী ঘোষ। পূজায় অংশগ্রহণ করে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই।"[২৯]

এখানে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় (গোয়াল বা ঘোষ) পূজার প্রধান আয়োজক হলেও, অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বিভাজন নেই। নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ এই উপাসনাকে একটি সমষ্টিগত সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত করে। এই ধরনের অংশগ্রহণ গ্রামীণ সমাজে সামাজিক সংহতি গড়ে তোলে। পূজা এখানে কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং একটি সামাজিক মিলনক্ষেত্র, যেখানে মানুষ একত্রিত হয়, সম্পর্ক দৃঢ় করে এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে পুনর্নির্মাণ করে। ব্রতীদের উপবাস পালন এই সমষ্টিগত চেতনার একটি অংশ, যা ধর্মীয় শৃঙ্খলা ও

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতীক। এই উপাসনার মাধ্যমে সমাজে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি হয়, যেখানে সকলেই নিজেকে এই ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে অনুভব করে।

দেবীর পূজা অত্যন্ত সহজ, সহজেই পাওয়া ফুল থেকে হয় দেবীর আরাধনা, অর্থাৎ দেবী এখানে কল্যাণময়ী।

> "এই দিনে মালঞ্চ দেবীর বিশেষ পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার উপকরণ বলতে বনফুল দিয়ে প্রস্তুত মালা, চাঁদমালা ও বনফুল।"[৩০]

মালঞ্চ দেবীর উপাসনা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে এটি কেবল একটি লৌকিক ধর্মীয় আচার নয়, বরং একটি বহুমাত্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। দেবীর অবস্থান, প্রতীকী উপাসনা, বলিপ্রথা এবং সামাজিক অংশগ্রহণ এই সবকিছু মিলিয়ে একটি জটিল কিন্তু সুসংহত ধর্মীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই উপাসনার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষ তাদের ভয়, আশা, বিশ্বাস এবং সামাজিক সম্পর্ককে একত্রে প্রকাশ করে।

অতএব, মালঞ্চ দেবী কেবল একটি দেবী নন; তিনি একটি সমাজের প্রতিচ্ছবি, একটি সংস্কৃতির ধারক এবং মানুষের মানসিক জগতের প্রতিফলন। এই ধরনের লোকায়ত ধর্মচর্চা সংরক্ষণ ও গবেষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাংলার প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির অমূল্য ঐতিহ্য।

তথ্যসূত্র:

১. বিদ্যারত্ন, শ্রী গণপতি, সম্পাদনা। *কালীকা-পুরাণীয় দূর্গা পূজা পদ্ধতি* । গুপ্তপ্রেস, ১৯২৩, কলিকাতা, পৃ. ১০।

২. চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার। *লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ* । পুস্তক বিপণি,১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ৯।

৩. তদেব, পৃ. ৯।

৪. তদেব, পৃ. ১১।

৫. ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*। পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫০, কলিকাতা, পৃ. ৯১।

৬. চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার। *লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ*। পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ৯।

৭. তদেব, পৃ. ১০।

৮. তদেব, পৃ. ১০।

৯. তদেব, পৃ. ১০।

১০. বিদ্যারত্ন, শ্রী গণপতি, সম্পাদনা। *কালীকা-পুরাণীয় দূর্গা পূজা পদ্ধতি*। গুপ্তপ্রেস, ১৯২৩, কলিকাতা, পৃ. ৩৯।

১১. তদেব, পৃ. ৩৮।

১২. তদেব, পৃ. ৩৮।

১৩. চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার। *লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ*। পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ১০।

১৪. তদেব, পৃ. ১০।

১৫. তদেব, পৃ. ১০।

১৬. তদেব, পৃ. ১১।

১৭. তদেব, পৃ. ১১।

১৮. স্থানীয় বাসিন্দা। ছাত্রী। বয়স ১৯।

১৯. স্থানীয় বাসিন্দা। গৃহবধূ। বয়স ৩২।

২০. স্থানীয় বাসিন্দা। গৃহবধূ। বয়স ৪৬।

২১. চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার। *লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ*। পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ.১৪।

২২. তদেব, পৃ. ১৫।
২৩. তদেব, পৃ. ১৫।
২৪. তদেব, পৃ. ১৫।
২৫. তদেব, পৃ. ১১।
২৬. তদেব, পৃ. ১১।
২৭. তদেব, পৃ. ১২।
২৮. তদেব, পৃ. ১২।
২৯. তদেব, পৃ. ১২।
৩০. তদেব, পৃ. ১২।